একক ২৭ ☐ শব্দালংকার

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ মূলপাঠ

২৭.৩.১ অনুপ্রাস

২৭.৩.২ যমক

২৭.৩.৩ শ্লেষ

২৭.৩.৪ বক্রোক্তি

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ অনুশীলনী

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- আপনি বাংলা কবিতার উচ্চারণ থেকে ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করার সমর্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারবেন।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনির প্রয়োগে বা সমাবেশে কবির দক্ষতা বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ আপনার মধ্যে তৈরি হবে।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনিপ্রয়োগের নানারকম কৌশল বুঝে নেওয়া ক্রমশ আপনার পক্ষে সহজ হবে।

২৭.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে জানলেন বাংলা কবিতার অলংকারের দুটি মূল বিভাগের কথা। এর প্রথমটি শব্দালংকার। এ অলংকার তৈরি হয় শ্রোতার কানে, কবিতার উচ্চারণ থেকে মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অলংকারের এই বিভাগটির পরিচয় আপনার কাছে তুলে ধরা হল। কিছু কিছু সূক্ষ্ম কৌশলগত পার্থক্যের কারণে শব্দালংকারেও যে ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাও দেখানো হল।

২৭.৩ মূলপাঠ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ—একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। 'শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? চারটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

Scanned with CamScanner

প্রথম উদাহরণ, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়'—এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার—শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও দুটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে 'চিনি' শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম 'চিনি' এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় 'চিনি'-র অর্থ 'জানি' বা 'বুঝি'। একই শব্দ 'চিনি' দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। 'চিনি'-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের সঙ্গে একটুখানি চমক লাগে 'চিনি' শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থ পাচ্ছে বলে। একই অর্থে দুবার উচ্চারণে ওই আস্বাদটুকু পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় না যদি বলি—'তোমাকে ত চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে!' অথবা 'ছেলেটা চিনি চিনি করে চেঁচায় শুধু, বেশি খেতে পারে না।' 'চিনি' শব্দের দুটি পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ থেকে যে মাধুর্য তৈরি হল তা-ও শব্দালংকার। এ অলংকার তো 'চিনি' শব্দটাকে ঘিরেই তৈরি হল এবং 'শব্দ' এখানে Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, sound বা ধ্বনি নয়।

তৃতীয় উদাহরণ,

'পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে মনের মতো
একটি বর দাও।'

'বর' শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হল উদ্ধৃত বাক্যে। এতে চমকাবার মতো কিছুই থাকত না, যদি 'বর' সাধারণভাবে একটিমাত্র অর্থই বোঝাত। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা জানেন, 'বর'-এর দুটি অর্থ—'আশীর্বাদ' আর 'স্বামী'। কুমারী মেয়ে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে পারে, 'মনের মতো' স্বামীও চাইতে পারে। 'বর' শব্দটি যখন দুটি অর্থের ইঙ্গিত নিয়ে শ্রোতার কানে বেজে ওঠে, তখন সেই উচ্চারণে তৈরি হয় চমক আর মাধুর্য। চকমসহ এই মাধুর্যই শব্দালংকার। এ-অলংকারের কেন্দ্রে আছে 'বর' শব্দটি, একটিমাত্র উচ্চারণে দুটি অর্থ নিয়ে। 'শব্দ' এখানেও Word, Sound নয়।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি (sound) হতে পারে, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিও (Word) হতে পারে? ধরে নেওয়াই যায়, ওপরের তিনটি উদাহরণ তো সে-কথাই বলে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় উদাহরণ অন্য কথাও বলে এবং সেই কথাই চূড়ান্ত। ধ্বনি আর শব্দের (Sound আর Word) এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি কথা। সেটি হল 'অর্থে'র ভূমিকা। শব্দ Word যখন অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, তখন শব্দে ধ্বনিও আছে, অর্থও আছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণের 'চিনি' আর 'বর' যখন শব্দালংকার সৃষ্টি করে, তখন ওই শব্দদুটির ধ্বনি আর অর্থই অলংকার-সৃষ্টির কাজ করে যায়। 'চিনি'র দুবার উচ্চারণে দুটি অর্থ আর

Scanned with CamScanner

'বর'-এর একবার উচ্চারণে দুটি অর্থ—এই অর্থের চমকেই তো এদের অলংকার। তবু এরা অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারই। এর কারণ, উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা ধ্বনিগুচ্ছই শ্রোতার কানে মাধুর্য সঞ্চার করে, অলংকার তৈরি করে। আর, সে অলংকার-সৃষ্টিতে কেবল সহায়তা করে একই ধ্বনিগুচ্ছের দুটি অর্থ—ধ্বনির মধ্যে চমক জাগিয়ে। অতএব, 'চিনি' আর 'বর'-এর অলংকার নির্মাণে ধ্বনি দেয় মাধুর্য, অর্থ দেয় চমক। ধ্বনিমাধুর্যই তো শব্দালংকার, অর্থ তার সহায়কমাত্র। ধ্বনির এখানে মুখ্য ভূমিকা, অর্থ নিতান্ত গৌণ। অন্যদিকে, প্রথম উদাহরণের অলংকার নির্মাণে একমাত্র ধ্বনিরই ভূমিকা (ক-ধ্বনি)।

ওপরের তিনটি উদাহরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই সত্যটিই বেরিয়ে এল—শব্দালংকার মূলত ধ্বনি নির্ভর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে অর্থের সহায়তা নিতে হয়। এ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, শব্দের (Word) উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' কখনো বর্ণধ্বনি (প্রথম উদাহরণে), কখনো শব্দধ্বনি (দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে)। চতুর্থ উদাহরণের সাহায্য নিয়ে দেখব, 'শব্দ' কখনো কখনো বাক্যধ্বনি।

যেমন,

'রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো ?'

—এখানে দুটি বাক্য। দুটি বাক্যেরই গোটা শরীরে ছড়ানো রয়েছে এই ধ্বনিগুলি : 'অজনী-অন্ধা-আসবি-আলো'। অতএব এটি বাক্যধ্বনি, এবং একই বাক্যধ্বনির দুবার আবর্তনে শব্দালংকার।

সুতরাং শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বাক্যধ্বনি, যা-ই হোক ('শব্দধ্বনি'র 'শব্দ' অবশ্যই Word)। তবে, শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার। কবিতার একটি স্তবকের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (Word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগ বা সমাবেশের কৌশলে মধুর শোনায়, এবং সেই মাধুর্য যদি শ্রোতার কানে তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার।

বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ-পরিমাণের দিক থেকে প্রথম চারটি শব্দালংকার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আর বক্রোক্তি।

২৭.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

(একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

বৈশিষ্ট্য :

১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

Scanned with CamScanner

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ন্ন-ন্ন, ধ্ধ-ধ্ধ) বা বিযুক্ত (শিযের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কাব্) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস (বৃত্তি + অনুপ্রাস) ; (খ) ছেকানুপ্রাস (ছেক + অনুপ্রাস) ;

(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস (শ্রুতি + অনুপ্রাস)।

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ঘ) আদ্যানুপ্রাস (আদ্য + অনুপ্রাস) ; (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস (অন্ত্য + অনুপ্রাস) ;

(চ) সর্বানুপ্রাস (সর্ব + অনুপ্রাস)।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

● **(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের 'ব' দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে। —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'জ' 'য' দুবার উচ্চারিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন 'চ'-এর ছয়বার এবং 'র'-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

শরতের শেষে সরিষা রো। —খনার বচন

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন 'শ' 'ষ' 'স' পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

Scanned with CamScanner

৫. ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

(i) কবরী দিল করবীমালে ঢাকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'কবরী' আর 'করবী' শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বর'-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবার—প্রথমবার 'বরী' এবং দ্বিতীয়বার 'রবী'। 'ব-র'-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী > রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ অনুসারে। অতএব, কবরী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(ii) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী। —জগদানন্দ

সংকেত : 'ঞ্-জ'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত 'ন্-ত্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া। —নজরুল

সংকেত : 'লক'-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত ('লোক')।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : 'কল'-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই—'কল', 'কিল' - 'কুল' - 'কুল')।

• **(খ) ছেকানুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস।

('ছেক' শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পণ্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ম্-ব্'-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুবার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ন্-ধ্'-এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দুবার।

Scanned with CamScanner

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'শ-ষ-র'-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে 'শিষের' ও 'শিশির' শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়, এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : 'শ-ষ-র' এবং 'শ-শ-র' ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। 'শ-ষ'-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ—

(i) মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'প-ঞ্-জ-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে 'পঞ্জর' ও 'পিঞ্জরে' শব্দদুটিতে। এখানে 'প-র' ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও 'ঞ্-জ্'-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে. স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের। —প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'র্-ম-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহে (প্রথম উচ্চারণ 'কর্মের > 'র্মের', দ্বিতীয় উচ্চারণ 'ঘর্মের > 'র্মের')। কিন্তু লক্ষণীয়, 'র্ম'-এর উচ্চারণ যুক্ত আর 'মের'-এর উচ্চারণ 'এ' স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

• (গ) শ্রুত্যনুপ্রাস :

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস।

(একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

(i) বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : 'গ-ঘ' ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও তারা বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'বেগে' আর 'মেঘে' শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ক-খ' (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'চিকন'-'লিখন'-'লিখন' শব্দটিতে

Scanned with CamScanner

(iii) নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ব-ভ' (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'নিরাবরণ' আর 'নিরাভরণ' শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের 'ছন্দোবন্ধগ্রন্থীগীত' অংশে 'দ-ন্-ধ-থ-ত' ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনির—ত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

■ **(ঘ) আদ্যানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : চরণের আদিতে 'বড়ো'-'জড়ো' শব্দে 'আড়ো' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে 'চিত্ত'—এই দুটি শব্দে 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি 'ই-অ' সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ত্ত' (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

■ **(ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমন-কী পঙক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি'—এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ম্-ক্' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) অমি নাব মহাকাব্য সংরচনে। —রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে 'আর্‌ব' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ব্‌-ব'-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(i) তবে
একদিন কবে —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙক্তি (line)। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে 'অবে' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

('বলাকা' কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে পঙ্‌ক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।)

■ **(চ) সর্বানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগনে-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে জড়ায়ে' এবং তৃতীয় শব্দযুগল 'এলোচুল-বনফুল'—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

২৭.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার।

(ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে। যেমন—রবি-রবী, বঁধু-বধূ, ঋণী-রিণী, জেতে-যেতে, আশা-আসা।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে। যেমন—'ধানের শীষে আগুনের শীষ' যমক (শীষ-শীষ), কিন্তু 'ধানের শিষের উপরে শিশির' অনুপ্রাস (শিষের-শিশির—স্বরধ্বনির পরিবর্তন), 'পূরবীর রবি' যমক (রবী-রবি), কিন্তু 'পূরবীর ছবি' অনুপ্রাস (রবী-ছবি—ব্যঞ্জনের পরিবর্তন)।

Scanned with CamScanner

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন—'যৌবন বন' যমক, কিন্তু 'যৌবন নব' অনুপ্রাস।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, 'সৌরভ-রভসে'। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব, এটি যমক নয়, অনুপ্রাস।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—

  (ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক।

- প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—

  (গ) আদ্যযমক ; (ঘ) মধ্যযমক ; (ঙ) অন্ত্যযমক ; (চ) সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) সার্থক যমক :**

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ :

১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'কীর্তিবাস' দুবার উচ্চারিত। প্রথম 'কীর্তিবাস' এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(ii) টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস বার্নিস ?
দাম চাস্ ? আজ নয়, মঙ্গল-বার নিস্। —উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

Scanned with CamScanner

সংকেত : 'বার্নিস' (চকচমে করার জন্য প্রলেপ) আর 'বার নিস্' (ওই দিনে নিয়ে যাস্) একই শব্দ না হলেও উচ্চারণে এক, অথচ অর্থে ভিন্ন।

২. সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) যেতে নারি জেতে নারী আমি হে —ঈশ্বর গুপ্ত

ব্যাখ্যা ঃ 'যেতে নারি' 'জেতে নারী'—এই দুটি শব্দযুগল সমধ্বনিযুক্ত, একই শব্দযুগলের পুনরাবৃত্তি নয়। 'জেতে-যেতে' শব্দদুটিতে জ-য সমব্যঞ্জন, আবার 'নারি-নারী' শব্দদুটিতে ই-ঈ সমস্বর। এই সমস্বর আর সমব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারিত শব্দযুগল উচ্চারণে এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে—'যেতে নারি' অর্থ 'যেতে পারি না', 'জেতে নারী' অর্থ 'জাতিতে স্ত্রীলোক'। অতএব, এটি সার্থক যমকের উদাহরণ।

(ii) তিনখানা নোট আনে সে 'দশ টাকার'
কিছুতে বুঝিতে পারে না দোষটা কার। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত ঃ 'দশ টাকার' (অর্থমূল্য) আর 'দোষটা কার' (কার দোষ)। 'অশ্' (দশ) আর 'ওষ্' (দোষ) সমধ্বনিযুক্ত (অ-ও সমস্বর, শ-ষ সমব্যঞ্জন) দুটি শব্দযুগল। এদের উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা।

■ **(খ) নিরর্থক যমক :**

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বন' প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে 'যৌবন' শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ 'বন' পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল 'অরণ্য'। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'রবি' ধ্বনিগুচ্ছ 'পূরবী' শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। 'রবি' স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। 'রবীঃ আর 'রবি' মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি 'ঈ' আর 'ই'-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

■ **(গ) আদ্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : 'ভারত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ 'কবি ভারতচন্দ্র রায়' অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ 'ভারতবর্ষ' অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

Scanned with CamScanner

■ **(ঘ) মধ্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : প্রথম 'তরি' অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

■ **(ঙ) অন্ত্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি বা পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ :

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ 'হয়ে যায়'। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

■ **(চ) সর্বযমক :**

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর 'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার, 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, 'সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ—বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ—প্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

২৭.৩.৩ সংশ্লেষ (শব্দশ্লেষ)

সংজ্ঞা : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার।

(একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

প্রকারভেদ

● বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের—

(ক) অভঙ্গা শ্লেষ (খ) সভঙ্গা শ্লেষ।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) অভঙ্গা শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গা শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত না হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত', দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গা শ্লেষ।

(i) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তাঁর আয়ুষ্কার ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূরবী' আর 'রবি' শব্দ দুটি দুটি করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'পূরবী'র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা 'পূরবী' কাব্য, আর-একটি অর্থ 'সূর্য'। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গা শ্লেষ।

মন্তব্য : 'পূরবী আর 'রবি' শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, 'পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে।' দ্বিতীয় অর্থ, 'পূরবী রাগিণীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে। অন্যদিকে, 'পূরবী'র নিরর্থক অংশ 'রবী' আর সার্থক 'রবি'—এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

■ **(খ) সভঙ্গা শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গা শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।

Scanned with CamScanner

ব্যাখ্যা : 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মূলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ'—এটি অখণ্ড 'মূলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—'বিশ্ববীণার মূল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মূলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

(ii) অপরূপ রূপ কেশবে —দাশরথি রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'কেশবে' শব্দটিকে না ভাঙলে এর অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটিকে 'কে' - 'শবে' এই দুটি অংশে ভাঙলে এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়—'মৃতদেহের ওপর কে ?' এর নিহিত অর্থ 'শবরূপী শিবের ওপর দাঁড়িয়ে যে নারী, তিনি কে ?' এর উত্তর 'কালী'। আর 'কেশবে' অর্থ কৃষ্ণ। 'কেশবে' শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ আর ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া গেল বলে এটি সভঙ্গ শ্লেষ।

Scanned with CamScanner

একক ২৮ □ অর্থালংকার

গঠন

২৮.১ উদ্দেশ্য
২৮.২ প্রস্তাবনা
২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়
২৮.৪ সারাংশ-১
২৮.৫ অনুশীলনী-১
২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার
২৮.৬.১ উপমা
২৮.৬.২ রূপক
২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা
২৮.৬.৪ সমাসোক্তি
২৮.৬.৫ অতিশয়োক্তি
২৮.৬.৬ ব্যতিরেক
২৮.৭ সারাংশ-১
২৮.৮ অনুশীলনী-২
২৮.৯ মূলপাঠ-৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি
২৮.৯.১ বিরোধমূলক : বিরোধাভাস (বিরোধ)
২৮.৯.২ শৃঙ্খলামূলক : একাবলি
২৮.৯.৩ ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস
২৮.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক : ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি
২৮.১০ সারাংশ-৩
২৮.১১ অনুশীলনী-৩

২৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে—

- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকের অর্থে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।
- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকে বা বাক্যে বা শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার দক্ষতা কবি কতটা দেখাতে পারলেন, তা বিচার করা সম্ভব হবে।
- বাংলা কবিতার স্তবকে বাক্যে শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার নানারকম কৌশল কবিরা কীভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, তা অনুসরণ করা ক্রমশ সহজ হবে।

Scanned with CamScanner

২৮.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে অলংকারের যে দুটি মূলবিভাগের কথা জেনেছিলেন, তার প্রথমটির (শব্দালংকার) পরিচয় পেলেন একক ৬-এ। একক ৭-এ পাবেন দ্বিতীয় বিভাগটির পরিচয়। এ বিভাগটির নাম অর্থালংকার।

এসব অলংকার তৈরি হয় কবিতার মনস্ক পাঠকের বোধে—তাঁর মনে-মস্তিষ্কে। বিভাগটি আয়তনে শব্দালংকারের তুলনায় অকেনটাই বড়ো, অনেক তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে, মূলপাঠকে তিনটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হল।

প্রথম অংশে অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আর তার অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণির পরিচয়, তৃতীয় অংশে অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণির পরিচয় সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া হল। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাসঙ্গিক অলংকারের ব্যাখ্যা করা হল।

২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। একটি উদাহরণ থেকে অর্থালংকারের এই স্বভাবটা বুঝে নেওয়া যাক :

'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
গগনের নীলগাঙে।'

'মেঘের মউজ'-এর অর্থ 'মেঘের ঢেউ', 'গগনের নীলগাঙ'-এর অর্থ 'আকাশের নীলরঙা নদী।' এই অর্থের ওপর নির্ভর করেই দুটি শব্দগুচ্ছ মিলেমিশে একটি দৃশ্য রচনা করেছে নীল আকাশের বুকে। সে-দৃশ্য মেঘের খেলার পাশাপাশি ঢেউ-তোলা নদীর। যে নদীর দৃশ্য মাটির ওপরে দেখতেই দ্রষ্টা অভ্যস্ত, কবি কল্পনার জোরে তাঁর মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন নীল আকাশের মেঘের খেলার দিকে, সেই আকাশের বুকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিলেন ঢেউ-তোলা নদীর দৃশ্যটি। কল্পনার চোখে দেখা এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই অলংকার, এ অলংকারটি তৈরি দল অর্থের ওপর নির্ভর করেই। অতএব, এটি অর্থালংকার। অলংকারটি যে কেবল অর্থের ওপরই নির্ভর করছে, শব্দের ওপর নয়—তা বোঝা যাবে, যদি দেখি, বাক্যটির অর্থ ঠিকঠাক রেখে দুটো-একটা শব্দ বদলে দিলেও অলংকারটি বেঁচে গেল।

প্রথমে দেখা যাক 'মউজ' আর 'গগন' শব্দদুটির বদলে একই অর্থের 'ঢেউ' আর 'আকাশ' বসিয়ে। তাহলে কথাটি দাঁড়াবে এই :

Scanned with CamScanner

'কোদালে মেঘের ঢেউ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে।'

দেখা যাচ্ছে, মেঘের খেলা থামে নি, 'গগন' 'আকাশ' হয়েও তার বুকে নীলরঙা নদীটি বইয়ে দিয়েছে আগের মতোই, 'মউজ'-এর সৌন্দর্য 'ঢেউ' উঠেছে বলে এতটুকু কমে নি। অর্থাৎ, 'মউজ-গগনে'র তৈরি অর্থসৌন্দর্য 'ঢেউ-আকাশে'ও অব্যাহত। এই অর্থসৌন্দর্যই তো অর্থালংকার। শব্দ বদলালেও অর্থ বদলায়নি, অলংকারও সরে যায়নি।

একটু দেখে নিই শব্দবদলের অন্য পরিণাম। শব্দবদলের আগে 'মেঘের মউজ' আর 'গগনের গাঙ' শব্দগুচ্ছ-দুটির মধ্যে অর্থালংকারের একটুখানি আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একটি শব্দালংকার। 'মেঘের মউজ'-এ ম-ধ্বনির দুবার এবং 'গগনের গাঙ'-এ গ-ধ্বনির তিনবার উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি শব্দালংকার। কিন্তু, শব্দবদলের পরে 'মেঘের মউজ' যখন 'মেঘের ঢেউ' হল, তখন ম-ধ্বনিটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। তেমনি, 'গগনের গাঙ'-এর বদলে 'আকাশের গাঙ' আসার ফলে গ-ধ্বনির গাঙটিও শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ, একই সঙ্গে ম-ধ্বনি আর গ-ধ্বনির শব্দালংকারটি হারিয়ে গেল। শব্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দালংকারের এই অপমৃত্যু জানিয়ে দিল, শব্দবদল এ অলংকারের পক্ষে অসহ্য। অথচ, অর্থালংকার একটু আগেই তা সহ্য করেছে।

অর্থালংকার শব্দবদল সহ্য করে ততক্ষণ, যতক্ষণ বদলে-যাওয়া শব্দের অর্থটুকু অক্ষত থাকে। এটাই দেখা গেল 'মউজ' থেকে 'ঢেউ' আর 'গগন' থেকে 'আকাশ'-এর বদলে। এবারে 'মউজ উঠেছে'-র 'টুকরো ছড়ানো' আর 'গাঙে'-র বদলে 'রঙে' বসিয়ে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে অর্থবদল ঘটলে তার পরিণাম কী ঘটে :

'কোদালে মেঘের টুকরো ছড়ানো
গগনের নীলরঙে।'

দেখতে পাচ্ছি, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো থাকলেও তার খেলা নেই, অর্থবদলের আগে ঢেউ-তোলা নদীর যে দৃশ্য আকাশে রচনা করেছিল অর্থালংকার, 'মউজ' আর 'গাঙ' তাদের অর্থ নিয়ে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য। আকাশের গায়ে পড়ে রইল এদিক-ওদিকে ছড়ানো কয়েক টুকরো মেঘ—তার রং নেই, কোনো আকর্ষণ নেই, তার গায়ে কোনো অলংকারই নেই—না শব্দালংকার, না অর্থালংকার। শব্দবদলে শব্দালংকারের লোপ, অর্থবদলে অর্থালংকারের লোপ। অর্থাৎ, শব্দ না টিকলে শব্দালংকার বাঁচে না, অর্থালংকার বাঁচতে পারে। কিন্তু, শব্দের সঙ্গে অর্থও সরে গেলে শব্দালংকারের সঙ্গে অর্থালংকারের সহমরণ ঘটে।

অতএব, শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য মূল তিনটি :

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার—প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে ; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারে সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখ্যা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। যে কটি লক্ষণ অলংকারগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করছে, সেগুলি এইরকম—সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকেদের দেওয়া।

২৮.৪ সারাংশ

কবিতার স্তবক বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তবে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। অর্থালংকার অর্থের অলংকার—অর্থের সৌন্দর্য। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে। অর্থ বদলে গেলে অর্থালংকার বাঁচে না। অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণি—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

২৮.৫ অনুশীলনী-১

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬১-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।)

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।

৩. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৪. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গে তুলনা করে থাকি। বলি, সতীর চোখদুটি শীলার চোখের মতো 'উজ্জ্বল' অথবা দার্জিলিঙের পাহাড় সিমলার মতো 'সুন্দর নয়' ইত্যাদি। এসব কথায় কোনো সৌন্দর্য নেই, অলংকার নেই। কিন্তু যদি বলি, 'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়', 'বাচ্চাটি ফুলের চেয়েও সুন্দর', তা হলে মনে মনে লাফিয়ে চলা ছেলেটার পাশে একটা ব্যাং-কেও লাফাতে দেখব, বাচ্চাটির মুখ তখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ ছেলেটার চলন আর বাচ্চাটির চেহারা এক-একটা ছবি হয়ে উঠবে আমাদের মনের চোখে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার। সাদৃশ্য এর লক্ষণ। সতীর চোখ, দার্জিলিঙের পাহাড় ছবি হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, একজনের চোখের তুলনা হল আর-একজনের চোখেরক সঙ্গে, ঐ পাহাড়টাকে তুলনা করা হল আর একটা পাহাড়ের সঙ্গে—অর্থাৎ, সদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা। এমন তুলনায় সৌন্দর্য নেই, অলংকারও নেই। অন্যদিকে, ছেলেটা ব্যাং বাচ্চাটি ফুল—এরা বিসদৃশ বলেই এদের তুলনায় সৌন্দর্য বা অলংকার হয়। এমনটা কেন হয়? দার্জিলিং-সিমলা সুন্দর হয়েও অলংকার পেল না, ছেলেটা ব্যাঙের মতো কুৎসিত লাফিয়েও অলংকার পেল কোন জাদুতে? এর কারণ, দার্জিলিং-সিমলার মতো সদৃশ বস্তুর তুলনায় কল্পনার প্রয়োজন নেই, যে দেখেছে সেই তুলনা করতে পারে তার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু ছেলেটা-

Scanned with CamScanner

ব্যাংটার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা একটা আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ। এ কাজে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সেই কল্পনার জোরেই কেউ আকাশের চাঁদে ধান-কাটা কাস্তের সাদৃশ্য খুঁজে পান, কেউ পূর্ণিমার চাঁদে ঝলসানো রুটি দেখতে পান। এঁরা নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে এমন-এমন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বের করে আনেন, সেই সাদৃশ্য দিয়ে এমন-এমন কথার ছবি নির্মাণ করেন, যা পাঠকের মনকে সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ভরে দেয়। তখনই গড়ে উঠে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের, মধুসূদনের কাব্য-কবিতা এই গুণেই এতো মহৎ—এক-একটি কাব্য যেন এক-একটি চিত্রশালা।

অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষণীয় হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।

২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।

৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

তিনটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক :

১. ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।

২. আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই, কাব্যের জাল বুনি।

৩. এলো ওরা / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।

প্রথম উদাহরণে 'ননী' আর 'শয্যা' এই দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য। 'মত' শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ননী' আর 'শয্যা' পৃথক দুটি বস্তু, এদের পার্থক্য আকারে আয়তনে জাতিতে। একই বস্তু হলে 'মত' শব্দ দিয়ে ব্যবধান তৈরি করতে হত না। অতএব, পার্থক্য পুরোপুরি মানা হল। এই 'মত' শব্দটিই আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ননী কোমল, শয্যা ও কোমল। 'কোমলতা' গুণটি দুটি বস্তুতেই সমান, তাই বস্তুদুটির মূল্যও গুণের দিক থেকে সমান। অতএব, সমান মূল্যও বরাদ্দ হল 'ননী' আর 'শয্যা'র জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'কাব্য' আর 'জাল'-এর মধ্যে সাদৃশ্য। বস্তুদুটি অবশ্যই বিসদৃশ, পুরোপুরি পৃথক। 'কাব্য' কবির লেখা, হয়তো মুদ্রিত একখানি বই—পড়ে আছে পড়ার টেবিলে। 'জাল' সুতো দিয়ে বোনা, হয়তো ছড়ানো আছে নদী-পুকুরের বুকে, মাছের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালে রেখে কবি 'কাব্য' আর 'জান'-কে এক করে দিলেন। কাব্য আর কাব্য রইল না, জাল হয়ে গেল। কলম ছেড়ে দিয়ে কবি সুতো তুলে নিলেন হাতে, বুনতে থাকলেন,জাল-কাব্যের জাল। এইভাবে তৈরি হল 'কাব্য' আর 'জালে'র অভেদ—কল্পনা।

তৃতীয় উদাহণে 'ওরা' মানে ইংরেজ, 'তোমার নেকড়ে' মানে আফ্রিকার নেকড়ে। ইংরেজদের নখ তীক্ষ্ণ, নেকড়ের নখও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণতা দুদিকে সমান নয়। ইংরেজের নখ বেশি তীক্ষ্ণ—এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে নেকড়ের পার্থক্য বা ভেদ। এই ভেদের ওপরই জোর দেওয়া হল 'চেয়ে' শব্দটি প্রয়োগ করে।

Scanned with CamScanner

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি ভঙ্গি।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !' —রবীন্দ্রনাথ

'রক্ত' আর 'জবাফুল'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করে অলংকার তৈরি হয়েছে উদ্ধৃত উদাহরণে। অতএব, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। বাক্যটিতে তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু 'জবাফুল।' 'এও' নির্দেশক সর্বনাম নির্দেশ করছে দুটি জবাফুল-কেই। কবির বক্তব্য জবাফুল নিয়েই, জবাফুল দুটি যে টুকটুকে লাল, এটাই কবি বলতে চান। অতএব, 'জবাফুল' প্রথম অঙ্গ—উপমেয়। জবাফুলের তুলনা হয়েছে রক্তের সঙ্গে। রক্ত যে কত লাল, তা সবার জানা আছে। সেই কারণেই রক্তের সঙ্গে তুলনা। অতএব, 'রক্ত' দ্বিতীয় অঙ্গ—উপমান।

রক্ত রাঙা, জবাফুলও রাঙা। রাঙা হওয়ার ধর্ম রক্তেও আছে জবাফুলেও আছে এবং এই ধর্মই জবাফুলকে তুলনীয় করেছে রক্তের সঙ্গে। অতএব, 'রাঙা' বিশেষণটিতে আছে এ শ্রেণির অলংকারের তৃতীয় অঙ্গ—সাধারণ ধর্ম।

'মতো' অব্যয়টি উপমান 'রক্ত'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে উপমেয় 'জবাফুল' আর উপমান 'রক্ত'কে বেঁধে রেখেছে একটি বাক্যে। এই বাঁধন-প্রক্রিয়াতেই ভিন্ন গোত্রের দুটি শব্দ জবাফুল-রক্ত একই বাক্যের মধ্যে ধরা দিল, 'মতো'-র ইঙ্গিতে বিসদৃশ বস্তুদুটি সদৃশ হিসেবে চিহ্নিত হল। অতএব, সাদৃশ্যবাচক 'মতো' অব্যয়ের সংযোজন ক্রিয়াটিই এ শ্রেণির অলংকারের চতুর্থ অঙ্গ-ভঙ্গি, সাদৃশ্য-প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি।

অর্থালংকারের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যমূলকে। ওই বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত ভঙ্গির ওপর। কীভাবে ভঙ্গির ওপর অলংকারটি টিকে থাকছে, দেখা যাক। আগের পাতায় উদ্ধৃত উদাহরণটিতে যে অলংকার হয়েছে, তার নাম 'উপমা' (একে একে অলংকারগুলির আলোচনা এর পরেই হবে)। এর অন্তর্গত উপমেয়-উপমান-সাধারণ ধর্ম—এই তিনটি অঙ্গের পরিবর্তনেও 'উপমা' উপমাই থাকবে :

মূল উদাহরণ—'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !'

পরিবর্তিত উদাহরণ—'এও যে দুধের তো সাদা, দুটি কাশফুল !'

এ দুটি উদাহরণের অলংকার যে একই, তা আন্দাজ করা যায়। এবারে ভঙ্গির পরিবর্তন করে দেখা যাক কী ঘটে :

Scanned with CamScanner

	ভঙ্গি	ভঙ্গির চিহ্ন	উদাহরণ	অলংকার
১.	উপমানের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ।	'মতো'	'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল !'	উপমা
২.	অভেদ-আরোপে উপমেয়-উপমান পাশাপাশি	'জবাফুলের রক্তলেখা'	'জবাফুলের রক্তলেখায় রাঙা চরণদুটি !'	রূপক
৩.	উপমানের সঙ্গে সংশয়বাচক শব্দের প্রয়োগ	'যেন'	'এও দুটি জবাফুল, যেন দুটি রাঙা রক্তাধার।'	উৎপ্রেক্ষা
৪.	উপমানের অনুল্লেখে একমাত্র উপমেয়	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা দেবীর চরণতলে।'	সমাসোক্তি
৫.	উপমেয়ের অনুল্লেখে একমাত্র উপমান	—'রক্ত'	'রাঙা রক্তের অঞ্জলিতে মায়ের পূজা হবে !'	অতিশয়োক্তি
৬.	সাদৃশ্যবাচক শব্দ + না-বোধক শব্দ = ভেদের প্রয়োগ	'মতো নয়'	'রক্ত এত রাঙা নয়, জবাফুলের মতো'	ব্যতিরেক

ওপরের আটটি উদাহরণ মূলত একই বাক্যের আটটি পরিবর্তিত রূপ। এ পরিবর্তন কেবল ভঙ্গির। উপমেয় (জবাফুল), উপমান (রক্ত), সাধারণ ধর্মের (রাঙা) কোনো পরিবর্তন নেই। আটটি ভঙ্গি থেকে পৃথক আটটি অলংকারের জন্ম, প্রতিটি অলংকারই সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের এক-একটি রূপ।

২৮.৬.১ উপমা

সংজ্ঞা : একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

(বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা)

বৈশিষ্ট্য :

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা, যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

Scanned with CamScanner

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছ-টি—

(ক) পূর্ণোপমা ; (খ) লুপ্তোপমা ;

(গ) মালোপমা ; (ঘ) স্মরণোপমা ;

(ঙ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ; (চ) বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) পূর্ণোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'ছুরি', 'উপমান 'প্রভাতরশ্মি', সাধারণ ধর্ম 'তীক্ষ্ণদীপ্ত', সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম'।

(ii) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারারত্ন যথা ! —মধুসূদন

সংকেত : উপমেয় 'সিন্দূরবিন্দু', উপমান 'তারারত্ন', সাধারণ ধর্ম 'শোভাসৃষ্টি', ('শোভিল'—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যথা'।

■ **(খ) লুপ্তোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যেকোনো একটি দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্তা + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে —সঞ্জীবচন্দ্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যে 'বন্যেরা' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), 'শিশুরা' উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম 'সৌন্দর্য' (সুন্দর' হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'বন্যেরা' এবং 'শিশুরা' এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে।

Scanned with CamScanner

অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন। —জীবনানন্দ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তলুনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনুট অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

চকি কলাপাতা সন্ধ্যা। —জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর 'কচি কলাপাতা' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। 'হরিণ-চোখ' আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের 'চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-ই হত উপমান। কিন্তু, প্রয়োগ-কৌশলে 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হরিণের চোখের মত চোখ'। 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা।

মন্তব্য : 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

Scanned with CamScanner

৫. উপমান সাধারণ ধর্মও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণী'র সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

■ **(গ) মালোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল

জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন। —বুদ্ধদেব বসু

সংকেত : উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(ii) উড়ে হোক ক্ষয়

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত

নিষ্ফল সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'সঞ্চয়', উপমান 'ধূলি' আর 'তৃণ'।

২৮.৬.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ ; নদী অঙ্গী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গী উপমানের অঙ্গের অভেদ হতে পারে।

Scanned with CamScanner

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

  (ক) নিরঙ্গরূপক ; (খ) সাঙ্গরূপক ; (গ) পরম্পরিত রূপক।

- নিরঙ্গরূপক দু-রকমের—

  (ক) কেবল নিরঙ্গরূপক ; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) নিরঙ্গরূপক :**

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক)।

উদাহরণ :

১. কেবল নিরঙ্গরূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'র ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি। —মোহিতলাল

সংকেত : উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য : এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিরর্থক যমক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মৌবনে' শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দের মর্যাদা পাবে।

২. মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

(i) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চিরযামিনী। —রবীন্দ্রনাথ

Scanned with CamScanner

সংকেত : উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ii) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'আমি', উপমান 'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপন', 'কাঁটা'। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

■ **(খ) সাঙ্গরূপক :**

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গরূপক।

(অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গরূপক।)

উদাহরণ :

(i) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
—যতীন্দ্রমোহন

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গ 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেইসঙ্গে উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গ 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরা'র ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গ যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(ii) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ; —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : অঙ্গী উপমেয় 'সৌন্দর্য', তার অঙ্গ 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গ 'বায়ু', তরী', 'পাল'।

Scanned with CamScanner

■ (খ) পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর ওকটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

(একটি নিরঙ্গরূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গরূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।)

উদাহরণ :

(i) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে। —রবীন্দ্রনাথ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আধাঁরে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেইকারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

মন্তব্য : 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গরূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(i) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনা'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

Scanned with CamScanner

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়েরে তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ

● উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (বাচ্য + উৎপ্রেক্ষা)

(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা)

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন, 'বুঝি', 'জনু', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৪র্থ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(i) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

■ **(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ :

(i) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গা।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় 'ভগবতী'তে উপমান 'দীঘল তরঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গিতে 'তরঙ্গো'র নাচন কবি লক্ষ করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় 'ব্যাধ'-কে উপমান 'পতঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে 'ব্যাধ' আর 'পতঙ্গো'র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। —যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল'। বাইরের রূপে লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

২৮.৬.৪ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং তার ব্যবহার বা আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আইম প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই। —নজরুল ইসলাম

Scanned with CamScanner

সংকেত : যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন 'সানাই-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল 'সানাই'-এর ওপর। অতএব, 'সানাই' এখানে অনুক্ত 'মানুষ'-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

ব্যাখ্যা : 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা' (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য-অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়, আঁচল বুকে-টানা এলোচুলে বসে-থাকা উদাসিনী নারীর ব্যবহার বা আচরণ কবি আরোপ করেছেন, 'বসুন্ধরা'র ওপর। ওই 'নারী'ই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

Scanned with CamScanner